International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-II, March 2024, Page No.25-39
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i2.2024.25-39

ভারতের নারী মুক্তি: স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার আদর্শগত রূপায়ণ

সঙ্গীতা মাজি

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, গলসী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The chief objective of this paper is to explore the role of Swami Vivekananda and Sister Nivedita in the enfranchisement of women in India in the late nineteenth century. Both the preceptor and his disciple ascribed enormous importance over the role of women as the source of power in all spheres of life. Religion, being the backbone of India's rich cultural tradition plays the key role of social transformation and according to Swami Vivekananda, it is none other than Women who, in Indian tradition have been worshipped as the source of power and vigour. Women are the expression of ethics, morality, pity, vigour and sacrifice. They preached women as the emblem women-hood, motherhood, self-sufficiency and the key vehicle of socio-cultural progression. Hence, they ascribed paramount importance over proper education, both in the moral field as well as in the religious and cultural fields to make women self-confident and self-sufficient.

Keywords: Women, Vigour, Source of Power, Enfranchisement, education.

আমাদের জীবন শক্তি নিয়ন্ত্রিত। জীবনের সর্বস্তরে শক্তির যে স্ফূরণ আমরা নিত্য অনুভব করি দেশ কালের গন্ডি সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতির সমস্ত ধর্মের মানুষের চেতনায় তা স্বতন্ত্র ভাবনায় দীর্ঘ যুগবাহিত হয়ে পরিস্ফূট এবং পল্লবিত হয়েছে। জগৎ জুড়ে সর্বপ্রকার মানুষের মধ্যে এই শক্তি ভাবনার বৈচিত্রময় প্রকাশ ঘটেছে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন বা ধর্মের মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের যে কাঠামো তার মেরুদন্ড হল ধর্ম। তাই ভারতবর্ষে এই শক্তি ভাবনা ধর্মের মধ্য দিয়ে একটি পরিনিষ্ঠিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। ভারতবর্ষের শক্তির প্রতীক হল নারী এবং নারীত্বে যতগুলি বিকাশ সম্ভবপর তার মধ্যে মাতৃভাব বা মাতৃত্বই সর্বোত্তম। নারীর মধ্যে মাতৃভাবের উদ্বোধনের মাধ্যমেই সৃজনশীলতা, ক্ষমা, করুণা, সাহস, ত্যাগ এবং সর্বোপরি পবিত্রতা প্রভৃতি চরিত্র-সংগঠক মহৎ এবং অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ যা নারীকে আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভর এবং সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান কারিগর হিসাবে গড়ে তুলবে। নারীত্বের চরমমুক্তি এখানেই, যেখানে সৎ চরিত্র, আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভর এবং সাহসী নারীদের দ্বারা ভারতবর্ষে প্রাচীন সনাতন ঐতিহ্যের আদর্শে আধুনিক সমাজগঠন সম্ভব হবে। তাই আধুনিককালে নারীশিক্ষা প্রযুক্তিগত দিকেও যেমন যুগোপযোগী হওয়া প্রয়োজন তেমনি এটাও খেয়াল রাখতে হবে আদর্শগত দিক থেকে সেই শিক্ষা যেন নারীর মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলীর বিকাশে সাহায্য করে।

কিন্তু বাস্তবে সমস্যা হল ভাবনার আদর্শের সাথে কার্যের সংঘাত। ভারতবর্ষ সেই দেশ যেখানে নারী তার সর্বোত্তম আদর্শে পূজিত। আবার সেই ভারতবর্ষে নারী চির লাঞ্ছিতা, অবহেলিতা, অত্যাচারিতা। আজকের একবিংশ শতকের সভ্যতাদৃপ্ত ভারতবর্ষেও তাই কন্যাভ্রূণ হত্যা, অ্যাসিড হামলা, গার্হস্থ্য হিংসার মত আরও নানা প্রকারের অতি নিন্দনীয় অত্যাচারের শিকার হতে হয় নারীকে। এই শৃঙ্খলিত অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে নারীর মুক্তি ঘটবে তার শিক্ষার প্রসারে যা প্রযুক্তিগতভাবে হবে আধুনিক এবং আদর্শগতভাবে হবে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারী। এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই নারীর বিকাশ সম্ভব।

তাই আমরা স্বাধীনতা পরবর্তী যুগেও আমরা দেখতে পাই যে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও খুব ধীরে হলেও খুব নিশ্চিতভাবে এবং প্রত্যয় পদক্ষেপে ভারতের নারীশক্তি সমাজের সর্বস্তরে সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, রাজনীতি বা অর্থনীতি প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে তার সাফল্যের স্বতন্ত্র স্বাক্ষর রেখে চলেছে এবং বহুকাঙ্খিত নারীত্বের যথার্থ মুক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। আমাদের জীবন শক্তি নিয়ন্ত্রিত। শুধু ইহজাগতিক ব্যাষ্টি জীবনই ন-য়, মহাজাগতিক সমষ্টি জীবনও শক্তি পরিচালিত। কোন কিছুর বিকাশ অবশ্যই শক্তি সাপেক্ষ। নান্দনিকতা থেকে মহাজাগতিক বিস্ফোরণ — সর্বত্রই এক অদ্বিতীয় মহাশক্তির বিকাশের তারতম্য মাত্র। শক্তির সাধন বা শক্তির পূজন তাই সর্বত্রই লক্ষিত। প্রায় সবদেশেই, সব জাতির মানুষের মধ্যেই এই শক্তিভাবনাটি পরিণতি লাভ করেছে বিভিন্ন ভাবনা-য়, বিভিন্ন আদর্শে, বিভিন্ন বিভবে। ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভারতবর্ষে তার শক্তিভাবনা যুগক্রমে পরিণতি লাভ করেছে তার ঐতিহ্যগত পারম্পর্য রক্ষা করে — তার নিজস্ব এক অদ্বিতীয় আধ্যাত্মিক মনীষায়।

ভারতবর্ষে চিরন্তন ঐতিহ্যে তার শক্তিভাবনা আবর্তিত হয়েছে 'নারী'কে কেন্দ্র করে বা নারীত্বের ঐশ্বর্যময় বিকাশকে কেন্দ্র করে। নারীর বা তার অন্তর্নিহিত নারীত্বের যতগুলি বিকাশ চরিত্রায়িত হয়েছে বা হতে পারে সেগুলি বিচার করলে অনায়াসেই এটি উপলব্ধি হয় যে ভারতবর্ষে নারীত্বের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে নারীর মাতৃরূপে। সর্বশক্তির আধাররূপে নারী বা নারীর যে রূপ ভারতবর্ষে আদৃত তা হল 'মা'। ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যে তাই 'মা' ও 'শক্তি' অভিন্ন। মাতৃপূজা আসলে শক্তি পূজারই নামান্তর। স্বামীজী 'ভারতীয় নারী' সম্পর্কিত বক্তব্যে বলেছেন "পাশ্চাত্যের নারী স্ত্রী শক্তি। নারীত্বের ধারণা সেখানে স্ত্রী শক্তিতেই কেন্দ্রীভূত। ভারতের একজন সাধারণ মানুষের কাছেও সমস্ত শক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত।" স্বামীজী আরো বলেছেন "জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে কারণ মাতৃভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক ও নিঃস্বার্থপরতার শিক্ষা ও প্রয়োগ দেখা যায়।" ফলে দেখতে পাচ্ছি আদর্শ ভারতীয় নারীর সর্বোত্তম বিকাশ মাতৃরূপে কারণ, মাতৃরূপেই স্নেহ, মায়া, ঔদার্য, সমদর্শীতা, সহনশীলতা এবং সর্বোপরি পবিত্রতা — এই চরিত্র সংগঠক গুণগুলির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছে। তাই মাতৃত্বের আদর্শেই ভারতীয় নারীর আদর্শরূপটি পরিনিষ্ঠিত আকারে ফুটে ওঠে — চরিত্রের সার্বিক ও সুষম বিকাশে নারীত্বের মুক্তি এবং তাকে কেন্দ্র করে জাতির উত্থান এভাবেই সম্ভব। আমাদের পরিবার তাই পিতৃতান্ত্রিক হলেও সর্বতোভাবে মাতৃকেন্দ্রিক। মাতৃহীন সংসার তাই শ্রী-হীন। এটি সমগ্র জাতিকে নিয়ে গঠিত বৃহৎ সংসারেও সত্য।

কিন্তু খেদজনকভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে এই ঐশ্বর্যময়ী শক্তি দীর্ঘযুগবাহিত হয়ে আজ অবহেলিত, অবদমিত এবং অনাদৃত। সুদূর বৈদিক যুগের নারীর সমাজে উন্নত অবস্থান থেকে সময়ের সোপান বেয়ে আজকের আধুনিক যুগে, আধুনিক সমাজে নারীত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে নারীর যে সার্বিক অবমূল্যায়ন ঘটেছে তার একটি রূপরেখা আঁকলে তা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বৈদিক যুগের সমাজে নারীর প্রতি কোন অশ্রদ্ধার ভাব তো দেখা যায়-ই নি বরং সেখানে নারীর স্থান ছিল যথেষ্ট উচ্চে। প্রাচীন আর্য ঋষিরা অনুভব করেছিলেন যে ব্যবহারিক জীবনে ও আধ্যাত্মিক জীবনে পুরুষের সঙ্গে নারীও সমান শক্তির অধিকারিণী। নারী ঋষিদের মধ্যে বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, অপালা, ঘোষা, গার্গী বিশেষ উল্লেখ্য। বৈদিক যুগে আর্যদের মধ্যে নারীশিক্ষার বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যায়। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে নারীর অধিকার ছিল এবং সে কারণে উপনয়ন বিধি পুরুষদের মত নারীদের ক্ষেত্রেও অবশ্য কর্তব্য ছিল। মেয়েরা ষোল সতের বয়স পর্যন্ত শিক্ষালাভের সুযোগ পেতেন। এরপর তাদের বিবাহ সম্পন্ন হত। এছাড়া আরেক শ্রেণির বিদ্যার্থিনী ছিলেন যাঁরা আরও অকেনদিন অবিবাহিত থেকে বিদ্যাচর্চায় জীবন অতিবাহিত করতেন। তাঁরা কেবল শিক্ষালাভ করে জ্ঞানচর্চায় উৎকর্ষ লাভ করতেন তা নয় শিক্ষাদানের ভারও তারা গ্রহণ করতেন। বৈদিক শিক্ষা ছাড়াও নানারকম ললিত-কলাতেও বৈদিক যুগের নারীদের বিশেষ পারদর্শিতার কথা জানা যায়। সঙ্গীত ও নৃত্যে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অধিকার থাকলেও বিশেষভাবে মেয়েরাই পারদর্শী ছিলেন। বাল্যবিবাহ ও সহমরণ প্রথা বৈদিক সমাজে প্রচলিত ছিল না। বিধবা রমণীদের অনেক সময় দ্বিতীয় বিবাহ হত। ধর্ম ও সমাজের দোহাই দিয়ে তাদের উপর কোন রকম অত্যাচার বা নির্যাতন হত না। তবে, যজুর্বেদের সময় থেকেই নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে থাকে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী হন এবং এর সঙ্গে ছিল অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। তখন থেকেই শুরু হয়েছিল ন্যায্য অধিকার থেকে নারীদের বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা।[১] সমাজে নারী জাতির মর্যাদা ধীরে ধীরে কমে আসায় স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করে তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে তৎকালীন সমাজপতিরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলেন — ১) শাস্ত্রে স্ত্রী শিক্ষার কোন উল্লেখ নেই। ২) মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে ব্যাভিচারিণী হয় এবং স্বামী ও গুরুজনদের অবজ্ঞা করতে শেখে। ৩) মেয়েদের অর্থ উপার্জন করতে হয় না বলে তাদের বিদ্যা শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। ধর্মশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিধিনিষেধকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজের একটি বড় অংশকে চরম অসাম্যের দিকে ঠেলে দিয়ে তাদের সামাজিক সচেতনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতকের সূচনা লগ্নে প্রাচ্য প্রতীচ্যের ভাবমিশ্রণে সমাজে ভাঙাগড়ার কাজ শুরু হওয়ার সাথে সাথে ধর্মান্ধতা ও যুক্তিহীন আচারপরায়ণতা উপর আঘাত আসতে লাগল। প্রকৃত বা সত্য ধর্মকে সামাজিক অনুশাসন বা সামাজিক কুসংস্কার থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজে নারীর যোগ্য স্থান নির্দেশ এবং তার সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের সূচনা ও গঠনমূলক সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করে রাজা রামমোহন রায়। নিজের আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৪ খ্রিঃ মেয়েদের স্বাধীনতা ও অন্যান্য ব্যাপারে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ দুভাগে বিভক্ত হয় — 'নববিধান' ও 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'।[২] 'নববিধান' মেয়েদের উন্নতিকল্পে 'আর্যনারী' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও 'বঙ্গ মহিলাসমাজ' নামে একটি আলাদা সংস্থা গঠন করে এবং মেয়েদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করে। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের নানা দিকে উন্নতি হতে থাকে। নতুন নতুন সৃজনশীল ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের প্রতিভার পরিচয় দিতে থাকে। এই সঙ্গে তাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও আত্মসম্মান বোধও জাগ্রত হয়। ১৮৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালীন বাংলার ছোটলাট হ্যালিডের সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল স্থাপন করেন। সরকারী সমর্থনে তিনি গ্রামে গ্রামে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বালিকা বিদ্যালয়গুলি চালানোর জন্য তিনি একটি নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডারও খুলেছিলেন। তবে অনেকেই মনে করেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কার কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণির

মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এই সমস্ত সংস্কারকেরা মূলত উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সমাজকে সামনে রেখেই সংস্কার করেছিলেন। তবে অনেকেই মনে করেন এই সমস্ত সমাজ সংস্কারকেরা সামাজিক অর্থেই তাঁরা নারীকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, আধ্যাত্মিক স্তরে সেই মর্যাদাকে খুব বেশি উন্নীত করতে পারেননি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগ ভাব দ্বন্দের যুগ। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার টানাপোড়েন এবং সংমিশ্রণ এ যুগের বৈশিষ্ট্য। এ যুগের শিক্ষিতা মেয়েরাও এর ব্যতিক্রম নন। এই সময় কিছু সংখ্যক নারী আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষালাভ করেন। কোন কোন নারী সমাজে সাংগঠনিক ভূমিকাও নেন। স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখী সমিতি' স্থাপন করেন। এই সমিতির মাধ্যমে নারীদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা, বিধবাদের শিল্পশিক্ষা ইত্যাদি গঠনমূলক কাজ চলতে থাকে। নারীর আত্মশক্তি উদ্বোধনে 'সখীসমিতি' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। তবে শিক্ষিতা মহিলাদের অধিকাংশ তখনো গৃহকেই নারীর প্রধান কর্মক্ষেত্র বলে মনে করতেন। তাই দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যখন নিজেরা লেখনী ধরেন তখনও তারা শুধুমাত্র নিজেদের শিক্ষা সামাজিক অবস্থান এবং পুরুষ পরিচালিত অনুশাসন সম্বন্ধে প্রশ্ন রাখছেন না নারীর মর্যাদার সঙ্গে নারীর কর্তব্য এবং নারীর জীবনের ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধেও সচেতনতার পরিচয় দিচ্ছেন। কার্যকরী শিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন।[৩]

সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ধর্মের নৈতিক শক্তি এবং নৈতিক বন্ধনের কথাও পত্র পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় অভিমত প্রকাশ করা হয় যে "স্ত্রীলোককে ধর্ম ও অধর্ম বুঝাইয়া দাও, ধর্ম অধর্মের ফল দেখাইয়া দাও, তুচ্ছ প্রলোভনে তাহার হৃদয় টলিবে না এবং অজস্র অবরোধ যাহা না করিতে পারে সে স্বয়ং তাহা সহজে করিবে।" সমাজমানস গঠনে ধর্মের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠাই নয়, মানবিক অধিকারের সঙ্গেও ধর্ম ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। সুতরাং মানুষকে তার প্রাপ্য মর্যাদা এবং নারীকে তার পূর্ণ মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি দেওয়া যে ধর্মের মর্মবাণী সেই ধর্মের প্রয়োজন তৎকালীন সমাজে খুব বেশি রকমই ছিল যা অবজ্ঞার সঙ্গে, অবিশ্বাসের সঙ্গে উপর থেকে নারীর উপর করুণা বিতরণ করবে না। নারী তথা মানুষের শক্তিতে পূর্ণ আস্থা এবং তার ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা নিবেদন এই হবে সেই ধর্মের সারকথা। নরনারী নির্বিশেষে মানুষের আত্মিক শক্তির বিকাশ এবং মনুষত্বে পূর্ণ মর্যাদা প্রাপ্তির উপযোগী এইরূপ ধর্মান্দোলনের জমি প্রস্তুত হয়েছিল। এই যুগপ্রয়োজনে সাড়া দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিংশ শতাব্দীরর দ্বিতীয়ার্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে সংঘর্ষের তীব্রতার প্রভাবে মানুষে মানুষে পারস্পরিক ভালবাসার পরিবর্তে ঘৃণা ঈর্ষা ও অমানবিকাতর গ্লানিতে সমস্ত পৃথিবীর দূষিত বাতাবরণের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবির মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন এই সংকটময় মুহূর্তে মানবজাতি রক্ষা পেতে পারে একমাত্র ভারতীয় পথে। ভারতীয় পথ বলতে তিনি সম্রাট অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার পথ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মের এবং সব মানুষের অন্তর্নিহিত ঐক্যের ভাবনাকেই বুঝিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন সেই মানসিকতা বা ভাবাদর্শ যা সমগ্র মানবসমাজকে একটি অখণ্ড পরিবাররূপে গড়ে তুলতে পারে। এই আদর্শকে ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে অসাধারণ যোগ্যতায় প্রচার করেছিলেন স্বামীজী। সুতরাং ঐতিহাসিক টয়েনবি ভারতীয় পথ বলে যাকে অবহিত করেছেন সেই পথের সন্ধান পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ধর্মভাবনায়।[৪] বস্তুত মানুষের অপূর্ণতা দূর করে পূর্ণতা লাভে তার সুপ্ত ব্যক্তিত্ব জাগ্রত করার পথ দেখিয়েছিলেন বলেই রামকৃষ্ণ

বিবেকানন্দের ধর্ম আধুনিক ভারতের নবজাগরণে এত প্রাসঙ্গিক। মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দের ধর্মে নারী পুরুষ সমমর্যাদা পেয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মানব সমাজের অগ্রগতি সমাজের দুই অবহেলিত অংশ নারী এবং জনগণের উন্নতি ছারা সম্ভব নয়। স্বামীজী ভারতবর্ষের অবনতির মূল কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নারীজাতির প্রতি দীর্ঘকালীন অবহেলা ও অত্যাচারের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন: যে দেশে শক্তিরপূজা নেই সেই দেশ কখনো জাগতে পারে না। স্বামীজীর মধ্যে এই ভাবনার বীজরোপন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই করেছিলেন। তিনি স্ত্রী জাতিকেই প্রকৃতির অংশজ্ঞানে 'মা' বলতেন। তিনি সব নারীর মধ্যে জগজ্জননীকেই দেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আক্ষরিকভাবে সমাজসংস্কারক নন, নারীমুক্তি আন্দোলনও প্রত্যক্ষভাবে সংগঠিত করেননি। কিন্তু তার ধর্মচিন্তায় নারীর জন্য সর্বোচ্চ স্থান নির্দিষ্ট ছিল। শিষ্য হরিনাথের প্রতি তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল "মেয়েদের ছোট করে দেখবি না।" সাম্যবাদী স্বামী বিবেকানন্দ সাম্যের ভিত্তিতে নারীর স্থান নির্দিষ্ট করে বলেছেন "মনুষ্যজাতির অংশ হিসাবে আমি ও তুমি এক... প্রাণী হিসাবে স্ত্রী-পুরুষ জীবজন্তু ও উদ্ভিব সকলেই সমান।" সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তায় প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নারী পুরুষের সমদৃষ্টি। একাত্মতার মধ্য দিয়ে এই ধর্ম নারীকে করেছে শক্তিময়ী। মূলত এই কারণেই তাদের আদর্শ আধুনিক ভারতে নারী আন্দোলনের পক্ষে আজও প্রাসঙ্গিক। আত্মিক ধর্মে বিশ্বাসী আধুনিক নারীবাদীরা মনে করেন, যে ধর্ম শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ অর্থাৎ সুবিচারের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে সেই ধর্মই নারীমুক্তির সহায়ক হতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত পরিবেশে নারীর গৃহকর্ম ও সামাজিক ভূমিকার পরিবর্তন নিয়ে আধুনিক নারীবাদী ঐতিহাসিকরা নানা গবেষণা ও পর্যালোচনা করেছেন। দ্রুত নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে নারীর সাংসারিক কাজও গৃহের পরিধির বাইরে যেতে বাধ্য করে এবং নারী নিজেকে পরিবর্তিত পরিবেশে যোগ্য করে নেয়।[৫] এই ইঙ্গিত শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণে ফুটে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে দিতে চেয়েছিলেন যাতে তারা এগিয়ে যেতে পারে মহোত্তর জীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই শক্তি সঞ্চার করেছিলেন নারীর মধ্যে যে শক্তির সাহায্যে তারা প্রয়োজন গৃহের বাইরে কর্মভার গ্রহণ করতে পারে যোগ্যতার সঙ্গে। তাঁর এই ভাবনাই অনুরণন শুনি স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে: "তোমরা যাহা বিশেষ করিবে তাহাই হইবে।... অপরের সাহায্য ব্যতীতই তোমরা সব করিতে পার। সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে উঠিয়া দাঁড়াও এবং তোমাদের ভিতর যে দেবত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে; তাহা প্রকাশ কর।" তাই স্বামীজী বলেন "অন্ধবিশ্বাসে মুক্তি নৈব নৈব চ। তোমাকে নিজের মুক্তির পথিকৃত হতে হবে নিজেরই সাধনায়।"

উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনে নারীর সামাজিক অবস্থানে উন্নতি যেখানে কিছুটা অনুকম্পা মিশ্রিত, কিছুটা পুরুষশাসিত সমাজে স্বার্থ প্রণোদিত সেখানে নারী উন্নয়ন প্রচেষ্টা খণ্ডিতই থেকে গিয়েছিল। নারীত্বের পূর্ণমহিমা বিকশিত হওয়ার সুযোগ ঘটেনি। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তায় কিন্তু নারীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ গড়ার ধর্ম ভাবনার জন্ম দিয়েছিলেন। স্বামীজীর সেই ভাবনায় মানুষ গড়ার শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বামীজীর মতে নারীদের সম্বন্ধে পুরুষদের হস্তক্ষেপের অধিকার শুধু শিক্ষাদান পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন চারাগাছ থাকে তখন লক্ষ্য হবে তাদের এমন যোগ্যতা অর্জ্জন করানো, যাতে নিজেদের সমস্যা নিজেরা মীমাংসা করতে পারে। তিনি যে স্ত্রী মঠের পরিকল্পনা করেছিলেন তার নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ভার মেয়েদের উপর ছেরে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে নারী মুক্তির অর্থ কেবল অমানবিক প্রথার কড়াল গ্রাস থেকে পরিত্রাণ নয়, বৃহত্তর

শোষণ ও অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দের আদর্শে মানুষের অন্তর্নিহিত অপরিমেয় সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেওয়া আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নারীচিন্তাকে তাদের সামগ্রিক দর্শন থেকে দেখলে ঠিক হবে না। জৈবিক সুখ নয়, আত্মিক উৎকর্ষই এর মূল ভিত্তি। আর সেই ভিত্তির মূলে আছে মানুষের অন্তচেতনার উন্মেষ এবং সর্বভূতে অভেদ দর্শনের চেতনা। এই চেতনা যদি মাতৃভাব সমন্বিত হয়, তা হলেই সমাজের আদর্শ রূপায়ন সহজতর হবে। নারী জাতির প্রতি মাতৃভাব হল এই ভাবনার আদর্শ। এখানে কিন্তু রক্তমাংসের মা হওয়াটাই আবশ্যক নয় বরঞ্চ এই ভাবের চরম বিকাশ ঘটবে যখন নারী শুধু নিজের গর্ভজাত সন্তানকেই নয় সমস্ত মানুষকেই সন্তান স্নেহে তাদের ভালবাসবে এবং তাদের কল্যাণ সাধনে রত হবে। বিখ্যাত নারীবাদী লেখিকা বেটি ফ্রীডানও স্বীকার করেছেন জগতের প্রতি মাতৃভাব থেকেই পারিবারিক ও সামাজিক মাতৃভাবের পূর্ণতাতেই নারী জীবনে আসবে যথার্থ মুক্তি। স্বামীজী আরও বলেছেন "জননীই প্রেমের আদর্শ, তিনিই পরিবারকে শাসন করেন, সমগ্র পরিবারটির উপর তাহার অধিকার।" মাতৃভাব শক্তিরই উৎস। এই শক্তি নারী তথা মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে। তাই স্বামীজী বলেছেন, "মাতৃত্ব হতেই বিরাট দায়িত্ব আসে। মাতৃত্বই ভিত্তি ও আরম্ভ।" মাতৃভাবের মধ্যেই নারীর স্বাতন্ত্র্য, আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস এবং দায়িত্ববোধ নিহিত।[৬]

ভারত সরকার ১৯৭৪ সালে প্রথম 'Towards Equity' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে। সেখানে দেখা যায় ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ, সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার নির্বাচনের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সমানাধিকার প্রভৃতি সত্ত্বেও বিশ শতকের গোড়া থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতীয় নারীর অবস্থা ক্রমশ অবনতি হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের তরফে বেশ কিছু নারী কল্যাণকামী পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ফলশ্রুতি স্বরূপ রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, খেলাধূলা, সংস্কৃতি প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রেই আজকের ভারতীয় নারী অনেক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিবার অথবা সমাজে নারীর অমর্যাদা এবং অধিকার হননের ঘটনা এখনও নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, রাজনৈতিক ক্ষমতা, ব্যক্তিগত সুরক্ষার নিশ্চয়তা সব ক্ষেত্রেই ভারতীয় নারীরা পিছিয়ে।

নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা নারীর প্রতি এই বৈষম্য ও বঞ্চনার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে পুরুষের একধরণের আধিপত্যকামী মানসিকতা এবং তার থেকে উদ্ভূত আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামোকেই এর জন্য দায়ী করেছেন। যাকে প্যাট্রিয়ার্কি বা পিতৃতন্ত্র বলা যেতে পারে। প্রখ্যাত নারীবাদী তাত্ত্বিক সিমোঁ দ্য বুভেয়া তাঁর বৈপ্লবিক রচনা 'The Second Sex' (১৯৪৯) সূচনায় নারীমুক্তি ও ক্ষমতায়নের মূল প্রশ্নগুলিকে উপস্থাপন করতে গিয়ে লেখেন : "অন্য সব মানুষের মত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তাবান হয়েও নারী অনুভব করে যে সে এমন এক জগতের বাসিন্দা সেখানে পুরুষ তাকে এক অন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করে। আর এখানেই নারীর অবস্থান বিচিত্রমাত্রা লাভ করে। পুরুষ নারীকে এক বস্তুসত্তা মনে করে। বুভেয়ারের মতে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যকামীতা কেবল সর্বজনীন পরিসরে নয়, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেও নারীর অধীনতা মূল কারণ। পিতৃতন্ত্র নারীকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের মন মতো দেখতে ও গড়ে তুলতে চায়। এতে সবথেকে বেশি ব্যাহত স্বতন্ত্র আত্মনিয়ন্ত্রণকারী সত্তা হিসাবে এক নারীর স্বাধীনতা। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় হিসাবে বুভেয়ারের বিশ্লেষণ থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আহরণ করা যেতে পারে।

প্রথমত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মানুষরূপে আপন ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে নারীর যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়ত ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ উপভোগের তুলনায় স্বাধীনতা অর্জনকে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের লক্ষ্য হিসাবে প্রাধান্য প্রদান।[৭]

উপরিউক্ত দুটি বিষয়কে নারীমুক্তি ও ক্ষমতায়নের নির্ণায়ক হিসাবে গণ্য করে উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের সূচনালগ্নে ভারতীয় এক গ্রাম্য নারী শ্রীমা সারদাদেবীর (১৮৫৩-১৯২০ খ্রিঃ) নাম বিশেষ উল্লেখ্য। সারদাদেবী কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি। তবে তার ছিল এক অনুসন্ধিৎসু এবং সংবেদী মন, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, দৃঢ় সংযত, সর্বংসহা, চিত্তবৃত্তি, অনলস কর্মতৎপরতা এবং সর্বোপরি ভালবাসায় ঘেরা এক অনন্য সাধারণ মাতৃহৃদয়। আপাতদৃষ্টিতে একজন সামান্য গ্রাম্য নারী হলেও শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পর তার ভক্তেরা সংঘজননীরূপে তাঁকে দেবীর আসনে বসিয়েছিলেন। অনায়াস ও স্বয়ংস্ফূর্ত সাবলীলতায় জীবনের যাবতীয় ওঠাপড়ার মোকাবিলা করেছেন। তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নারী 'সশক্তিকরণ' যা আজও আমাদের এই একুশ শতকেও প্রেরণা জোগায়।

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন নারী শক্তির সার্থক উদ্বোনের উপর সমাজ, দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। সারদাদেবীর মহিমা উপলব্ধি করে তিনি বলেছেন "আমাদের দেশ এত অধম কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে।" বিবেকানন্দ ঊনবিংশ শতাব্দীর অত্যাচরিতা নারীদের আত্মবলে উদ্বুদ্ধ হওয়ার নব্যমন্ত্র শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "সব শক্তি তোমাদের ভিতরে রহিয়াছে। তোমরাই সব করিতে পার। ইহা বিশ্বাস কর। মনে করিও না তোমরা দুর্বল।" দেহের থেকে মনের শক্তি বেশি। কেবল ইচ্ছাশক্তিতেই সব হবে। দুঃখ বেদনা থাকবেই এবং "দুঃখ থেকেই সহানুভূতি সহিষ্ণুতা সর্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছা শক্তির বিকাশ হয়, যে শক্তি বলে, মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলেও একটু কম্পিত হয় না।" সারদাদেবীর জীবনচর্যা বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণের ইহলীলা সংবরন করার পর তাঁর কৃচ্ছসাধন এবং একই সঙ্গে আত্মশক্তি ও নেতৃত্বের বিকাশ বিবেকানন্দের এই উক্তির যতার্থতাই প্রমাণ করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: সত্য, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা এই তিন শক্তির বলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব। সেই সঙ্গে তিনি তিনটি জিনিসের প্রয়োজন - অনুভব করার মত হৃদয়, ধারণা করার মত মস্তিষ্ক ও কাজ করার মত হাত। এই সত্য সারদাদেবীর জীবনে সংগ্রাম ও সিদ্ধির ভিতর নিহিত আছে। তিনি দেখিয়েছেন আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করলে নারী আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। তিনটি ধারায় সারদাদেবীর শক্তির বিকাশ হয়েছে। প্রথম ব্যক্তিগত জীবনে সংগ্রাম এবং নারীর ব্যক্তিত্বের উন্মেষ; দ্বিতীয় অনুপ্রেরণা জলসিঞ্চনে অঙ্কুর অবস্থায় রামকৃষ্ণ সংঘের জীবন রক্ষা, পালন ও পুষ্টি সাধন; তৃতীয় 'ভালবাসার সংসার' গঠনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে নারী নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের বীজবপন। সংসারের মধ্যে থেকেও সাংসারিক তুচ্ছতার উপরে উঠে বিরাট সংঘ পরিচালনার শক্তি অর্জন করেন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি নারীকে আত্ম প্রতিষ্ঠার পথ দেখাতে পেরেছিলেন। ষোড়শী পূজার মাধ্যমে সারদাদেবী আপন শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং শক্তির বিকাশ ঘটেছিল এবং তিনি সেই শক্তিকে যুগোপযোগীভাবে ব্যবহার করেছিলেন। শিক্ষাও দিয়েছিলেন তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে। স্বয়ং স্বামীজী কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সারদাদেবীর উপদেশ ও অভিমত প্রার্থনা করে তাঁর নির্দেশই শিরোধার্য করতেন। স্বামীজী দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন - "আমার ওপর বাপের চেয়ে মায়ের কৃপা সহস্র গুণে বেশী।"[৮]

সমসাময়িক সমাজের অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনেক বিষয়ে সারদাদেবীর অবস্থান ছিল রীতিমত বৈপ্লবিক, যদিও সমাজ সংস্কারক বা রাজনৈতিক নেতাদের যত বাগাড়ম্বর তাঁর ছিল না। জয়রামবাটীতে আমজাদ নামে এক মুসলমান ডাকাতকে তিনি সন্তান স্নেহে আপন করে নিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের অন্দরমহলে এই নিয়ে সারদাদেবীকে নানা গঞ্জনা শুনতে হত। কিন্তু তিনি সেই সবকে গুরুত্ব না দিয়ে বলতেন "আমার শরৎ যেমন ছেলে এই আমজাদও তেমন ছেলে" শরৎ ছিলেন রামকৃষ্ণ দেবের অন্যতম সন্ন্যাসী পার্ষদ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বহুমানিত সম্পাদক সন্ন্যাসী সারদানন্দ। অতুলনীয় মাতৃভাবে সারদাদেবী মনুষ্যত্বের পরম মূল্যবোধে সারদানন্দজী ও আমজাদ – একজন ব্রহ্মবিদ মহাপুরুষ এবং অন্যজন কুখ্যাত ডাকাত – এদের মধ্যে কোন তফাৎ করেন নি। এমনকি জয়রামবাটিতে থাকাকালীন তাঁকে গ্রামের মোড়লদের বিধানে জাতপাতের বিধিনিষেধ না মেনে চলার জন্য শাস্তিস্বরূপ জরিমানাও দিতে হয়েছে। ১৮৯৮ সালের গোড়ার দিকে স্বামী বিবেকানন্দের তিন পাশ্চাত্য অনুরাগিনী সিস্টার নিবেদিতা, মিসেস ওলি (সারা) বুল, এবং মিস ম্যাকলাউড ভারতে এসে সারদাদেবীর সাথে দেখা করলে সারদাদেবী তাদের সাথে শুধু দেখাই করলেন তা নয় একসঙ্গে বসে আহার করলেন এমনকি নিজের বিছানায় বসতেও দেন। সারদাদেবী সব সময় চাইতেন মেয়েরা যথাযথ শিক্ষা লাভ করুক। এমনকি তিনি তাদের উপযুক্ত জীবিকা অবলম্বন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতেও উদ্বুদ্ধ করেন। সারদাদেবীর অনুপ্রেরণায় তাঁর ঘনিষ্ট অনুরাগিনী ও বিদূষী সন্ন্যাসীনী গৌরী মা কলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে ১৮৯৫ সালে মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরে উত্তর কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। সারদাদেবীর নামে তার নামকরণ হয়'শ্রী শ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম"। ১৮৯৮ সালে ভগিনী নিবেদিতার উদ্যোগে বাগবাজারে আর একটি বিদ্যালয়ের সূচনা হয়। সারদাদেবী স্বয়ং সেই বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। বিধবা রমণীদের করুণ অবস্থা দেখে সারদাদেবী ব্যাথিত হতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানেও তিনি নিজে দীর্ঘ কেশ রাখতেন, সরু লাল পাড় সাদা কাপড় পরতেন এবং হাতে সোনার বালাও পরতেন। 'প্রবাসী' এর সম্পাদক রমানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন -"আত্মার অমরত্বে এইরূপ বিশ্বাস সকলের থাকিলে সংসারে অনেক দুঃখ পাপ তাপ দুর্গতি দূর হয়। বেশ কয়েকবার নিজের ফটোগ্রাফ তোলার অনুমতি দেন তিনি। উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের গোড়ায় এ সব কম বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ছিল না। শুধু তাই নয় তিনি তাঁর বিধবা ভক্তদের উপযুক্ত আহার গ্রহণ এবং শরীরের যত্ন নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন। সারদা দেবীর জীবনে সব থেকে আশ্চর্যজনক দিকটি এই যে, আপাতভাবে পরস্পর বিরোধী জীবনচর্চার বিচিত্রধর্মী নানা ধারা তার জীবনে মিলেমিশে এক অপূর্ব সুষমামণ্ডিত রূপ ধারণ করেছিল। আশাপূর্ণা দেবীর ভাষায় "মা সারদা বহুবিধ মতানৈক্যের সমাধানে একটি ঐক্যের রূপ; সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবমানের জন্য একটি দ্বন্দ্বাতীত মাতৃমূর্তি।[৯]

সারদা দেবীর উপর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মানবধর্মের বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়। আবার এই শক্তিতে তিনি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ করেন। এইভাবে পল্লীবালিকার সংঘজননীতে উত্তরনের মধ্য দিয়ে নারীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং তার মনুষ্যত্বের সাধনাও সিদ্ধ হয়। জীবনের সংগ্রাম ব্যক্তিত্বের সংকোচন নয়, সম্প্রসারণ ঘটায়। মাতৃত্ব যে মায়ের পায়ে শৃঙ্খল না হয়ে এগিয়ে যাওয়ার, তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পাথেয় হতে পারে সারদা দেবীর জীবনে তা পরিস্ফুট। সারদাদেবী চেয়েছিলেন সেই মূল্যবোধ ও অন্তর্দৃষ্টি যা তার ক্ষুদ্রতা এবং তুচ্ছতাকে অতিক্রম করে যথার্থ শক্তিরূপিনী হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। তিনি কিন্তু বর্তমান কালের নারীবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে মেয়েদের শক্তিময়ী হয়ে উঠতে বলেননি – এই

বোধ তার ধর্মচেতনার সাথে যুক্ত থাকবে। এই ধর্ম মানবতার ধর্ম, নারীর অন্তঃশক্তির ধর্ম। জীবনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলে এই শক্তি যে মূল্যহীন সারদাদেবীর আচরণে সেই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রাচীনের জীর্ণতাকে বর্জন করেছেন এবং নূতনের মধ্যে যা যুগোপযোগী তার সঙ্গে প্রাচীনের সমন্বয় করে শাশ্বত মানবিক গুণের প্রকাশ একই সঙ্গে নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মনুষ্যত্বের সাধনার পথ নির্দেশ করেছেন। ব্যবহারিকের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধন ঘটেছে সারদাদেবীর জীবনে তাই ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার, জাতীয়তার সঙ্গে বিশ্ববোধের সমন্বয় এই জীবনবোধে প্রতিফলিত হয়েছে। সারদাদেবী হয়ে উঠেছিলেন একাধারে ভালবাসায় ভরা মা, সেবাপরায়ন গৃহিনী আবার প্রাজ্ঞ প্রশাসক এবং অধ্যাত্ম জগতে অনন্যসাধারণ নেত্রী, অন্যদিকে সামাজিক অবিচারের তিনি ছিলেন নিরব অথচ অবিচল প্রতিবাদী এবং ধর্মসমন্বয় অনুশীলনে অগ্রপথিক। এইসবের মধ্য দিয়েই সারদা দেবী হয়ে উঠেছিলেন নারী মুক্তি ও সশক্তিকরণের মূর্ত বিগ্রহ এবং শেষ পর্যন্ত এক আদর্শ মানবী। তাই বলা যেতেই পারে যে শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষতম প্রতিনিধি এবং একই সঙ্গে নূতন আধুনিক ভারতীয় নারীর নবীনতম প্রতিনিধি। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন নারী শক্তির সার্থক উদ্বোধনের উপর সমাজ দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। স্বামী বিবেকানন্দ উনিবিংশ শতাব্দীর অত্যাচারিতা নারীদের আত্মবলে উদ্বুদ্ধ হওয়ার নবমন্ত্র শুনিযেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "সব শক্তি তোদের ভিতরে রহিয়াছে। তোমরা সব করিতে পার, ইহা বিশ্বাস কর, মনে করিও না তোমরা দুর্বল। দেহের চেয়ে মনের শক্তি বেশি, কেবল ইচ্ছা শক্তিতেই সব হবে। দুঃখ বেদনা থাকবেই এবং দুঃখ হতে সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, সর্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়। যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলেও একটু কম্পিত হয় না।"[১০]

শুধু নারীশিক্ষা নয় সার্বিক উন্নতির একমাত্র পথ হিসাবে তিনি যা নির্দেশ দিয়েছেন তার মূল কথা হল প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার। এই শিক্ষার যে কোন মানুষের অন্তর্নিহিত যে পূর্ণত্ব তার বিকাশের মধ্য দিয়ে এক ধর্মবোধকে জাগ্রত করবে; তার ফলে সে আপনই নিজেকে ভালত্বের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ নির্বাচন করবে। অর্থাৎ উপর থেকে চাপিয়ে ভাল নয়, একজন ব্যক্তি তার নিজস্ব বোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজেকে ভালত্বের দিকে নিয়ে যাবে এর জন্য তার শিক্ষার সুযোগ তৈরী করাই কেবল কাজ, তাকে পথ নির্দেশ দেওয়া নয়। নারী শিক্ষা-র ক্ষেত্রেও স্বামীজীর বক্তব্য এই পথের অনুসারী। তিনি বলেছেন : "... নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্য করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।" তাহাদের হইয়া অপর কেহ এই কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে, আর এ জগতে অন্যান্য দেশের মেয়েদের মত আমাদের মেয়েরাও এই যোগ্যতা লাভে সমর্থ।" অর্থাৎ তাঁর সুস্পষ্ট অবস্থান হল নারী শিক্ষায় নারী মুক্তির একমাত্র পথ। কারণ শিক্ষার মাধ্যমে নারী শক্তি আপন মুক্তির পথ নিজেই নির্ধারণ করে নেবে। ভারতে সমাজকেন্দ্রিক ভাবনার মধ্যেও স্বামীজীর ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। অতীতের সবকিছু মুছে দেওয়ার বা প্রচলিত সবকিছু ভেঙে দেওয়ার পক্ষপাতি স্বামীজী ছিলেন না। বিদেশী শিক্ষার বাহ্যিক চাকচিক্য তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি মেয়েদের জন্য এমন শিক্ষা চাইতেন যা তাদের জাতীয় জীবন ধারায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করবে। ভারতীয় নারীর স্বাধীনতা বিকাশ সম্পর্কে বিবেকানন্দের যে কল্পনা ছিল তা কোনরকম আন্দোলন করে সাধিত হতে পারে না। তার মতে যথার্থ স্বাধীনতা হল পরোক্ষ, নিরব এবং সাংগঠনিক।

স্বামীজীর স্ত্রী শক্তির বিকাশ পরিকল্পনার এক ঐহিক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিবেদিতাকে বলেছিলেন "আমাদের বিদ্যালয় থেকে এমন সব শিক্ষিতা মেয়ে হবে যারা ভারতের সকল মেয়ে পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে।" এখানেই উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বামীজীর কাছে নারী মুক্তির অর্থ সীমার বন্ধন থেকে মুক্তি যা নারীর যথার্থ শক্তিকে উন্মোচিত করে দেবে। এই আদর্শের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ গুণের বিনিময়ের উপর ভিত্তি করে তিনি স্ত্রী মঠের পরিকল্পনা করেন। স্বামীজী চাইতেন এমন শিক্ষা যা আধুনিক নারীর মধ্যে প্রাচীন ভারতের নারীদের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে। কিন্তু চাননি যে, তারা প্রাচীনের প্রতিরূপ হবেন মাত্র। তিনি মনে করতেন আদর্শ শিক্ষা তাই যা তাদের প্রাচীনকে অতিক্রম করতে সহায়তা করবে, তাদের মধ্যে বীরোচিত দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে জননী সুলভ হৃদয়ের সমাবেশ ঘটাবে। স্বামীজী চাইতেন এমন শিক্ষা যাতে মেয়েদের কল্পনা শক্তির বিকাশ হয় এবং তাদের অন্তর্নিহিত বৃত্তিগুলিও বিকাশ পায়; তাদের কমনীয় এবং মাধুর্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের শক্তি সমন্বিত হয়। তাঁর পরিকল্পিত সারদা মঠ এই উদ্দেশ্য ও আদর্শকে সামনে রেখেই বাস্তবায়িত হয়েছে। সারদা মঠের বহুমুখী কর্মময়তা, আধুনিক সমাজে তার নিরব ও বহুমূল্য আত্মনিবেদন আজ ভারতবাসী হিসাবে সর্বোপরি আধুনিক ভারতের এক নারী হিসাবে যা গর্ববোধ করতে পারি।[১১]

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে যে সব বিদেশী নিজ জীবনকে ভারতের বেদীমূলে বলিদান করে আমাদের কাছে অমর হয়ে আছেন তাদের মধ্যে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল অন্যতম। ভিন্ন দেশ, জাতি, ভাষা, সভ্যতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মানুষ হয়েও তিনি যেভাবে ভারতবর্ষ তথা ভারতবাসীকে ভালবেসে আপন করে নিতে পেরেছিলেন তা দেখলে বিস্ময় জাগে । সকল বাধাবিপত্তিকে আপন শক্তির দ্বারা জয় করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন এদেশের মানুষের কাছে একান্ত আপনজন ভগিনী বা সিস্টার নিবেদিতা রূপে।

পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে স্বামীজী সেদেশের নারীদের শিক্ষা তাদের স্বাধীন জীবনযাত্রার দিকটি দেখেছিলেন এবং ভারতীয় নারী জাগরণ ও তা তদানীন্তন সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্ত করার দিকটি তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়েছিল। নারীমুক্তির দিশারীরূপে তিনি একজন দৃঢ়চেতা নারী চেয়েছিলেন - যিনি হবেন চরিত্র বলে বলীয়ান, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী, অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরপুর, তেজস্বী সিংহী তুল্য যা তৎকালীন ভারতবর্ষের নারীদের মধ্যে স্বামীজীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। নিবেদিতার মধ্যে স্বামীজী আবিষ্কার করেছিলেন বহু প্রতিভাসম্পন্না সেই মহীয়সী দিপ্তীময়ী নারীকে যিনি ভারতবর্ষের নারী জাগরণের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন।

নিবেদিতার মধ্যে পাশ্চাত্য জাতির মহৎগুণগুলির বিকাশ ঘটেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু স্বামীজী জানতেন নিবেদিতার ভারতীয় আদর্শ ভাবধারার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। উত্তরভারতের ভ্রমণ করার সময় স্বামীজী নিবেদিতাকে ভারতের আদর্শ ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। তিনি ভারতীয় জনসাধারণ সম্বন্ধে সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে সনাতন হিন্দু সমাজের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করেন। স্বামীজী যখন বুঝলেন মার্গারেট ভারত সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য কৃত সংকল্প তখন তিনি তাঁকে লিখলেন "তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাছে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য বিশেষত ভারতের নারী সমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। তোমার শিক্ষা,

ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেলটিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী যাকে ভারতের প্রয়োজন।" "স্বদেশের নারীগণের আমার কতগুলি সংকল্প আছে। আমার মনে হয় সেগুলিকে কার্যে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পার।"[১২] স্বামীজী মার্গারেটকে ভারতবর্ষের কাজের জন্য এভাবেই আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বামীজী ভারতবর্ষে এলেন ১৮৯৮এ। স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্য মন্ত্রে দীক্ষিত করে নামকরণ করেন নিবেদিতা। সনাতন হিন্দু সমাজের সঙ্গে নিবেদিতার নিবিড় নৈকট্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্বামীজী শক্তিময়ী নিবেদিতাকে মহাশক্তিময়ী শ্রীমা সারদা দেবীর কাছে সমর্পন করেন। গুরু তার শিষ্যার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং আত্মিক উন্নতির পথটিও সুগম করতে চেয়েছেন মায়ের সান্নিধ্যে রেখে। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার প্রসঙ্গে স্বামীজী নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : "তোমার ছাত্রীদের জন্য কতগুলি নিয়ম কর এবং ঐ নিয়ম সম্বন্ধে তোমার মতামত ও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দাও। সুবিধা হলে একটু উদার ভাবের প্রমাণ দিও।" স্বামীজী স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করতেন, সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা থাকবে আবার সেই সঙ্গে তার গভীর ও বাইরে যাবার অভাব থাকবে না। নিয়ম থাকবে কিন্তু তা যেন পীড়া না দেয়। স্বামীজী তাই বলতেন "পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত পূর্ণ শাসন ইহাই আমাদের মৌলিকত্ব।" এমন শিক্ষাকে স্থায়ী ও যথার্থ হিতকর করার জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন ছিল – অর্থ ও সর্বোপরি একদল নারী যারা এই শিক্ষা বিস্তারের জীবন উৎসর্গ করতে পারবে।[১৩]

নিবেদিতা আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা ও আত্মত্যাগে সার্থক মিলন দেখতে চেয়েছিলেন নারীর মধ্যে। এই সার্থক মিলন ঘটানোর জন্য ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর বাগবাজারের ১৬নং বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে নিবেদিতা রামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর পূজা করে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দের উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের নাম দেন 'রামকৃষ্ণ গার্লস স্কুল'। বিদ্যালয়টিকে স্বামীজীর আদর্শে গড়ে তুলতে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

এই স্কুলের মাধ্যমেই বাংলায় তথা ভারতীয় নারীরা কুসংস্কারের গন্ডী ভেঙে পেয়েছিলেন এক আনন্দময় জীবন, আত্মবিশ্বাস, দেখেছিলেন মুক্তির আলো। আধুনিক ভারতের নারীচেতনার ইতিহাসে এই বিদ্যালয়টির অবদান অপরিসীম। নিবেদিতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথাকথিত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশির স্বামীজীর মানুষ গড়ার শিক্ষারূপ যে স্বপ্ন সেই শিক্ষাই এখানকার শিক্ষার্থীরা পেয়েছে। নিবেদিতার বিদ্যালয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষার পাশাপাশি ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগানোর কথা বলা হয়। নিবেদিতার বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষাদান করা হয়। এছাড়াও বহির্জগতের সঙ্গে নারীদের পরিচয় লাভের জন্য বোটানিক্যাল গার্ডেন, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বেলুড় মঠ প্রভৃতি স্থানে পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হত। মেয়েদের স্বনির্ভরতার শিক্ষাও এখানে দেওয়া হত। যেমন সেলাই, উলবোনা, চরকা চালানো ইত্যাদি। মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় এই বিদ্যালয়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও সারদা দেবীর নারীভাবনার এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এই বিদ্যালয়। জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে প্রতিষ্ঠা করাও এই বিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম।[১৪]

নিবেদিতা ভারতের বালিকা ও নারীদের জন্য যে শিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন তা জাতীয়ভাবের উপর প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। তিনি মনে করতেন জাতীয় ভাব বাইরে থেকে আরোপ করা যায় না। অন্তর থেকে এর বিকাশ হওয়া উচিত। ভারতীয় নারীর মধ্যে জাতীয় ধর্মগুলির সঙ্গে জাতীয়বোধের

সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় নারী ভবিষ্যতে তার প্রকৃত মহিমা নিয়ে জাতির নিকট আত্মপ্রকাশ করবে। তখনই যোগ্য শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবে পরিণত হবে বিশ্বসেবায় বিশ্বের সাথে একাত্ম বোধে। নারীর আত্মসত্তার উন্মেষের সাথে মনুষ্যত্বের সাধনার উত্তরণ - এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নারী ভাবনার সারবস্তু। সারদাদেবীর জীবনচর্যায় তার ব্যবহারিক রূপায়নের অনুপ্রেরণায় নিবেদিতা এই বালিকা বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন।[১৫]

স্বামী বিবেকানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে চেতনাময়ী নারী ভাবীকালের জন্য সুষম সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সংকেত দিতে পারে। নারী জাতিকে পূর্ণ মর্যাদায় ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মিলন দেখতে চেয়েছিলেন। নারীর উন্নয়নের জন্য ত্যাগ ও সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত স্ত্রী মঠের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এমন নারীর যার মধ্যে জাতীয় বিশ্বচেতনার সংশ্লেষ ঘটবে। ভবিষ্যতে নারী নিয়ন্ত্রিত স্ত্রী মঠের বীজ উপ্ত হয়েছিল সারদাদেবীর নিয়ন্ত্রিত বৃহৎ সংসারে শক্তির সঙ্গে। জ্ঞান ও প্রেমের সংমিশ্রণে নারীর সৃজনশীলতা প্রকাশ যে সম্ভব তার জ্বলন্ত উদাহরণ শ্রী শ্রী মা সারদা।

স্বামীজী সারদাদেবীকে আধ্যাত্মিক শক্তির আধার রূপে চিনেছিলেন। তাই মায়ের চরিত্রকে আদর্শ করে অপরকে তেমন আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। মায়ের আদর্শ কেবল ভারতীয় নারী নয় সমগ্র বিশ্বের নারীকে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ দেখাবে। স্বামীজী অনুভব করেছিলেন সংঘ ব্যাতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। তাই তিনি বলেছিলেন: "মা কে কেন্দ্র করে গঙ্গার পূর্ব তটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন করতে হবে। স্বামীজী তার একাধিক পত্রে ও মঠের নিয়মাবলীতে তার এই প্রাণের আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছিলেন: "গৃহলক্ষ্মীগণের পূজাকল্পে তাদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা বিকাশকল্পে মেয়েদের মঠ করে যাব।" স্ত্রীমঠের মূল ভিত্তিই হবে ব্রহ্মচর্য আর মূলমন্ত্র হবে আধ্যাত্মিকতা, আত্মোৎসর্গ ও আত্মসংযম। সেবা ধর্ম হবে তাদের জীবন ব্রত। ত্যাগ, সংযম এবং ধর্ম পরায়ণতা হবে নারীর অলংকার। এমন আদর্শ জীবন দেখে তারা সকলের কাছে সম্মান পাবে। ভারতের স্ত্রী লোকের জীবন এইরূপে গঠিত হলে পুনরায় এদেশে সীতা, সাবিত্রী, গার্গীর পুনরায় অভ্যুত্থান ঘটবে। স্বামীজী তার এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে না পারলেও পরবর্তীকালে তার গুরুভাই এবং কয়েকজন পবিত্র চরিত্র আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্না নারী সমাজের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে এসেছিলেন।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর হাত ধরে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা মাতাজীর সম্পাদনায় শ্রীশ্রী মায়ের জন্ম শতবার্ষিকী (১৯৫৩-৫৫) পুণ্য লগ্নে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্ত্রী মঠ প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫৪ সালে ২রা ডিসেম্বর 'শ্রী সারদা মঠ' এর উদ্বোধন হয় স্বামীজীর প্রস্তাবিত গঙ্গার পূর্বতটে। প্রথম অধ্যক্ষা হন প্রবাজিকা ভারতী প্রাণা; সহাধ্যক্ষা হন প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রানা। ১৯৫৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সন্ন্যাসিনীদের ট্রাস্টি করে সাংবিধানিক ভাবে সারদা মঠ স্বাধীন হয়ে যায়। বেলুড় মঠ সারদা মঠের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে এই ট্রাস্টির হাতে অর্পন করেন। স্বামীজীর স্বপ্ন সার্থক হয়। বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন কলেজ উদ্বোধন প্রসঙ্গে মাধবানন্দজী বলেছেন, স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল মেযেরা স্বাধীনভাবে নিজেদের সমস্যা নিজভাবে সমাধান করুক। এই শিক্ষায়তনের মাধ্যমে সেই স্বপ্নই যেন বাস্তবের ভূমিতে পদক্ষেপ রাখে। ১৯৬০ সালে বেলুড় মঠের পরামর্শে সারদা মঠ 'রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন'অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহিলা ও শিশুদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মূলক কাজ শুরু করেন। সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের কার্যাবলী পাঁচভাগে বিভক্ত - শিক্ষা, চিকিৎসা সংক্রান্ত সেবা, গ্রামোন্নযন, অভাবগ্রস্ত আর্তের সেবা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার। কলকাতার মাতৃভবন

সারদাসেবা কুটীর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা চিকিৎসার মাধ্যমে আর্তের সেবা করে চলেছে প্রতিনিয়ত।[১৬] বর্ধমান জেলার শিল্ল্যাঘাট গ্রামে সারদা মঠ মিশনের শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে গ্রামোন্নয়নের এক জ্বলন্ত উদাহরণ সৃষ্টি করে। বর্তমানে ভারতবর্ষ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়াতেও তাদের কর্মকাণ্ড অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু আজ আমাদের সামনে এরূপ উচ্চ আদর্শ থাকা সত্বেও এবং সেই আদর্শে উদ্বোধিত নারীসমাজের যুগোপযোগী উন্নয়নের বহুমুখী সম্ভাব্যতা সত্বেও আমাদের সংশয়াত্মক চিত্তবৃত্তিতে প্রশ্ন জাগে এত কিছু পরে সত্যিই কি নারীশক্তির প্রকৃত জাগরণ ঘটেছে? উদ্বোধন ঘটেছে নারী মুক্তির? গৃহে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ যা অনেক ক্ষেত্রে শুধু মানসিক নয়, শারীরিক অত্যাচারের রূপ পরিগ্রহ করে। ইদানীং কালে ঘটে যাওয়া একের পর এক অ্যাসিড হামলা, নির্ভয়া কান্ডের মত ঘটনা - যা আমাদের শিহরিত করে, মানবিকতার অস্তিত্বকে সঙ্কটে ফেলে দেয় বা কন্যাভ্রূণ হত্যার মত ঘটনা, যা প্রায় স্বাভাবিক ঘটনার রূপ পরিগ্রহ করেছে - এই সব কিছু আমাদের সংশয়কে আরও দৃঢ় করে। সুধী মনে প্রশ্ন আসে সংশয় ও শঙ্কা জাগিয়ে সত্যিই কি হয়েছে বা হচ্ছে বিবেকানন্দ - নিবেদিতার স্বপ্ন সফল? আমরা কি পেরেছি স্বামীজীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে নতুন ভারত গড়তে - যেখানে নারী তার পূর্ণ শক্তি ও মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে সমাজ গড়ার অন্যতম পথিকৃত হবে। নারীর প্রতি অত্যাচার যদি নারীর অবনমনের একটি দিক হয় তাহলে আরও একটি দিকও তার আছে যা আমাদের কম বিস্মিত বা ব্যথিত করে না। কন্যাভ্রূণ হত্যা যদি একটি দিক হয় তবে আর একটি দিক হল সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা যেখানে দেখি পরপর কন্যা সন্তান হয়েছে বলে জনৈকা 'মা' ঠাণ্ডা মাথায় টানা দশ দিন সেই শিশুসন্তানটিকে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করে হত্যা করেছে অথবা বহুবিতর্কের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও হবু নার্সদের নির্দয় প্রহারে ছোট ছোট কুকুরছানাদের হত্যার ঘটনা আমাদের সবিস্ময় প্রশ্ন জাগায় - এই কি আমাদের ঐতিহ্যগত ভাবে মাতৃত্বের জয়গান গাওয়া ভারতবর্ষের ঘটনা? যেখানে দেশ নিজেই 'মাতৃরূপে' পূজিতা? এসব প্রশ্ন আমাদের বিচলিত করে ঠিকই কিন্তু যদি সুগঠিত বিশ্লেষণ করা যায় তবে এর বিপরীত চিত্রও উঠে আসে যা থেকে আমরা যুগান্তর সাধনের এই ধারা প্রত্যক্ষ না করলেও তার সংগঠন সংশয়াতীত ভাবে আঁচ করতে পারি। আসলে আমরা যুগকে প্রত্যক্ষ করি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সীমিত অভিজ্ঞতার আলোকে সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী আবার আমাদের মানসিকতা পরিচালিত এবং আমাদের মানসিকতা দৈনন্দিন জীবনের নানা জটিলতায় আবিল এবং স্বার্থপূর্ণ - তাই তা নিরপেক্ষও যেমন নয় তেমনি তার ব্যাপ্তি বা গভীরতা কোনটাই নেই। আমরা যদি স্বামীজীর শিক্ষাদর্শে আমাদের মানসিকতার যথাযথ বিকাশ ঘটাতে পারি প্রাত্যহিক জীবনের ছোট-বড় নানা দ্বন্দ্ব সংঘাত জনিত স্বার্থপূর্ণ আবিলতার উর্দ্ধে তুলে মনকে নিস্কলুষ ও স্বার্থশূন্য করতে পারি তাহলে আমাদের মধ্যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম নেয় এবং সেই সংস্কৃত মনের মনীষায় যুগচিত্র ঠিক ঠিক ভাবে প্রতিফলিত হয়ে যুগদর্শী হওয়া যায়। কিন্তু আমাদের পক্ষ সেটা সম্ভব হয় না। তাই যুগদর্শনের ক্ষমতাও আমাদের সীমায়িত। এখন এই সীমায়িত দৃষ্টি নিয়ে যুগের পরিবর্তন একনজরে ধরা পড়ে না - পড়ার কথাও নয়। কারণ আমরা একটি যুগসন্ধিক্ষণে বাস করছি যেখানে যুগান্তর সাধন প্রক্রিয়াটিই এক বা একাধিক শতাব্দী জুড়ে হতে পারে। এই পরিবর্তনের সবটা একসাথে এক ঝলকে ধারণা করার মত মহাপুরুষকল্প মণীষা আমাদের সাধারণ মানুষের নেই কিন্তু তবু স্থির মস্তিষ্কে ভাবলে যুগপরিবর্তনের চিহ্নগুলি আমরা ধরতে পারি। নারীর অবমূল্যায়ন যেমন আধুনিক সময়ের একটি অন্ধকারময় দিক তেমনি সমাজের গঠনমূলক বিভিন্ন স্তরের প্রগতিশীল কাজকর্মে নারীর ক্রমোন্নয়ন সেই

অন্ধকারকেই আমাদের মনে আশার আলো সঞ্চারিত করে। অ্যাসিড হামলা নির্ভয়াকাণ্ড যদি একটি দিক হয় তবে সাম্প্রতিকতম তিনতালাক বিল পাশ এবং শবরীমালা মন্দিরে মহিলা প্রবেশের ব্যাপারে অন্ধ ধর্মীয় আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে দেশের আইনের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ – মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিয়ে মহিলাদের আনুকূল্য বিধান আমাদের আনন্দ ও স্বস্তি দেয়। আজ দেশের সমস্ত ক্ষেত্রে – সাহিত্য, কলা, নন্দন, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে সমাজ অর্থনীতি, রাজনীতি প্রতিরক্ষা ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আজকের ভারতীয় নারী পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে গৌরবময় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। আজ মহিলা পরিচালিত থানা, মহিলা প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন দেশের আইন শৃঙ্খলা সুরক্ষার মত ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ। যদিও শুধুমাত্র বড় পদক্ষেপ হিসাবেই এটির মূল্যায়ন করা ঠিক নয় বরং এই মূল্যায়ন - এই নিরিখে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দক্ষতা ও সেই সামর্থ্য অর্জনে নারী আজ এতটাই আন্তরিক যে পুরুষের চেয়ে সে কায়িক পরিশ্রমেও আর পিছিয়ে নেই। পর্বতারোহন, ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম, সুমেরু বা আন্টর্কটিকা অভিযানের মত প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক শক্তিসাপেক্ষ কার্যগুলিতেও পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আজকের নারী সব কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ফলে নির্ভয়া যদি আমাদের মুখে আশঙ্কার ছায়া ফেলে তাহলে বিন্দু ও কনকাদুর্গারা আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে। আমাদের মনকে কবির এই বাণীতে প্রত্যয়ী করে তোলে যে "ভারতে আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।" সত্যের জয় হয় ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে। স্বামীজী যেভাবে চেয়েছিলেন দেশের নারী শক্তিকে জাগাতে, শ্রীশ্রী মায়ের আদর্শ সামনে রেখে নিবেদিতার মধ্য দিয়ে তা নিশ্চিতভাবেই সংঘটিত হচ্ছে নিজস্ব ধারায় কিন্তু দৃঢ় ও প্রত্যয়ী পদক্ষেপে এবং সর্বব্যাপী রূপে দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রতিকূল ঘটনার অভিঘাত আমাদের বিচলিত করলেও আমাদের অন্তর্লোকের বিশ্বাস ধ্বনিত হয় রাবীন্দ্রিক সুরে – "নিশিদিন ভরসা রাখিস।"

তথ্যসূত্র:

১। Romila Thapar, 'Looking back in History', Indian women, ed. by D. Jain, New Delhi Publication Division, Govt. of India, 1975, P. 7

২। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশি থেকে পার্টিশন, ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, পৃ. ১৮৮-১৮৯

৩। Sekhar Bandyopadhyay, From Plassey to Partition : A History of Modern India, Orient Black Swan, Delhi, 2004, p. 157
৪। Dipesh Chakrabarty, 'The Difference – deferral of a colonial Modernity : Public Debates on Domesticity in British India', Subaltern Studies : Essays in Honour of Ranajit Guha, Vol. 8, ed. by David Arnold and David Hardiman, Oxford University Press, Delhi, 1994, p. 50-88.
৫। Ghulam Murshid, Reluctant Debutante : Response of Bengali women to Modernisation, 1849-1905, Rajshahi University, Bangladesh, 1983, p. 55-60
৬। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৩য় খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ২০১২, পৃ: ২১৬
৭। রতন খাসনবীশ, 'নারী চেতনা নির্মাণ', এবং মুশায়েরা, সিমন দ্য বোভোয়ার, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, সম্পাদক এবং প্রকাশক – সুবল সামন্ত, পৃ. ২৪৪-২৪৭
৮। সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, শতরূপে সারদা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, পৃ: ৩৯৯-৪২০
৯। স্বামী গম্ভীরানন্দ, শ্রীমা সারদাদেবী, উদ্বোধন কার্যালয়, মার্চ ২০০৪, পৃ. ২৫৮-২৬১, ৩০১-৩০৩
১০।স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষা প্রসঙ্গ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৭, পৃ. ৮৭-৮৮
১১।সুস্মিতা ঘোষ, বাংলার নারীমুক্তি-আন্দোলন এবং শ্রীশ্রী মা সারদাদেবী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ১৭৫-১৮০
১২।স্বামী বিবেকানন্দ, পত্রাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬৪,পৃ: ৫৬২, ৫৬৬, ৫৮৫
১৩।শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, স্বামী শিষ্য সংবাদ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ২০৩-২১০
১৪।শঙ্করীপ্রসাদ বসু, নিবেদিতা লোকমাতা, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃ: ২৮, ১৭৮-১৮০, ১৯৬-২০১
১৫।সঙ্কলক ও সম্পাদক স্বামী চৈতন্যানন্দ, ভারতচেতনায় ভগিনী নিবেদিতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৭, অক্টোবর, পৃ: ৪২-৪৫, ৫৯
১৬।প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ভগিনী নিবেদিতা, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, কলকাতা, ২০১২, পৃ: ১৪৫-১৫২

সহায়ক গ্রন্থ:

১। Geraldine Forbes, Women in Modern India. (The New Cambridge History of India, vol. 4, 2) Cambridge 1998
২। Partha Chatterjee, The Nation and its Fragments : Colonial and Post-Colonial Histories, Princeton University Press, 1993
৩। Collected & Edited by Shankari Prasad Basu, Letters of Sister Nivedita, Nababharat Publishers, Calcutta, Vol. II, 1992
৪। The complete works of Sister Nivedita, Vol. I, Sister Nivedita Girls' School, Calcutta, 1967
৫। Sister Nivedita's lectures and writings, Sister Nivedita Girls' School, Calcutta, 1967